Citizens' Manch for Conservation of Coastal Environment (CMCCE) observed the world Wetland day 2010

02 February at 12 p.m 2010 under the theme of 'Caring *for wetland an answer to climate change* a human chain was organized at the premises of Khulna press club by Citizens Manch for Conservation of Coastal Environment (CMCCE) for observing the world wet land day 2010

The eco-system of costal wetland has been changed as an adverse consequence of various project including costal embankment projects. As a result increasing man and environment conflict. It is noteworthy that adverse influence of climate change would go to there where natural ecosystem would have changed.

There are many rules and regulation in Bangladesh for preservation of wetland. But it has not yet made or prepared any convention or specific law regarding wetland. It also did not get any importance or significance in terms of wetland in the water management process of the country. As a result, wetland has been decreasing day by day. There is not enough information regarign wetlands in the southwest coastal region of Bangladesh. In the program principle Jafor immam, Advocate Abdullah Hossen bachu, Rafiqul Haque Khakon, Advocate Ashok Kumar saha, Shamima sultana shilo, Khilid Hossen, Mafujur Rahman, Mukul, Q, S mukta, Debproshat sarkar, Debroto Roy, Shorab Hosen, Kazi Zavad Khalid Pasha Joy, Abdus Shoban, Habbur Rahman Kobir, Ali Reza, Roton Sarkar, Shapon Mondal expressed their solidarity by demanding integrated wetland management side by side by creating awareness among society.

Member secretary (acting) of the Manch Marina Juthi of IRV expressed the ending remarks with expressing gratitude and thanks to all who are presented on the behalf of platform. Mamunur Rashid, BELA anchored the human chain.

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১০

জলাভূমি সুরক্ষাই পারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাভূমির অবস্থা-ইস্যু ও ব্যবস্থাপনা

জলাভূমি হচ্ছে ইকো সিস্টেমের একটি সমন্বিত ধারা যার গঠন প্রক্রিয়ায় পানির প্রাধান্য বেশী এবং যার প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জলাভূমি হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখনে দীর্ঘ সময় সিক্ত থাকে এবং প্রাণী, লতাগুল্ম, তৃণ ও মাইক্রো অরগানিজমসমূহ জন্মে। বিশ্বের সমগ্র জীব বৈচিত্রের ৩/৪ ভাগই হচ্ছে জলাভূমি। জলাভূমি নদী ব্যবস্থাপনায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেটা যদি উপলব্ধি করা যায় এবং রামসার কনভেনশন অনুযায়ী যদি নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার ভিতর যদি জলাভূমি সংরক্ষণকে সমন্বিত করা হয় তাহলে উভয় ব্যবস্থাই পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। জলাভূমি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জৈবিক উৎপাদনশীল ইকো-সিস্টেম এবং সর্বোচ্চ অব্যবহৃত এবং যার সর্বোচ্চ ব্যবহার কলাকৌশল আমাদের আয়ত্বে আসে নাই। জলাভূমির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অর্ধ শতাব্দী মাত্র। জলাভূমি শুধু পরিবেশের ভারসাম্য ও মানুষের জীবনজীবিকার সহায়তার পাশাপশি ভূ-গর্ভস্থ ও উপরস্থ পানির সরবরাহ গড়ে উঠেছে। কৃষি ও চারণভূমি, বন্য প্রাণীর আবাসস্থল, খাদ্য-শৃংখলা, স্থানীয় **Micro Climate**, বন্যা ও দুর্যোগ প্রশমন, ভূজল-পুন:পূরণ, দুষণ হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। সারা বিশ্বের ৬-৮% জলাভূমি। জমির আনুপাতিক হারে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে জলাভূমির পরিমাণ সর্বোচ্চ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জলাভূমি আছে ৭/৮ মিলিয়ন হেক্টর এবং সমগ্র জমির ৫০% যার মধ্যে ৪৮০,০০০ হেক্টর নদী-জলাধার এবং ৬১০০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ জলাভূমি অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের ইকোলজি, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিতে জলাভূমির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের কৃষি ছিল জলাভূমি নির্ভর। কিন্তু আধুনিক কৃষি এই জলাভূমিকে পতিত জমি হিসেবে বিবেচনা করে জলাভূমি ধ্বংস করেছে। আজ বিজ্ঞানীরা সার্বজনিনভাবে জলাভূমিকে সম্পদ ও মানুষের **Life suport** অপরিসীম গুরুত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৬০ দশকে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সরকার পানি ব্যবস্থাপনার মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে। যার মূল লক্ষ্য ছিল সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপদন এবং এই লক্ষ্যে ১/৩ ভাগ মোট কৃষি জমিকে বন্যামুক্ত বাঁধের আওতায় আনা হয়। মাস্টার প্লান অনুযায়ী সারাদেশকে ৫৮টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন বাঁধের আওতায় আনা হয় যার মধ্যে ছিল ৭৫৫৫ কিঃ মিঃ বাঁধ, কয়েকশত পোল্ডার ও ৭৯০৭টি অবকাঠামো (খান ১৯৯১:১১)।

বিশ্ব বিখ্যাত পানি বিশেষজ্ঞ মিসিসিপি নদী কমিশনের সাবেক সভাপতি জেনারেল হার্ডিন, মাস্টার প্লানের কারিগরি পরামর্শক নেদারল্যান্ডের অধ্যাপক টিএইচ থিকস ও বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রশান্ত মহালানবিশ এই প্রকল্পের ভবিষ্যত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। মহালানবিশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন এতে নদী নাব্যতা হারাবে এবং প্লাবনভূমি গঠন ও জীববৈচিত্র বিপদগ্রস্ত হবে পরিণতিতে আমাদের জন্য বিপর্যয় বয়ে আনবে।

মাস্টার প্লানের অংশ হিসেবে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (**CEP**)'র লক্ষ্য ছিল অধিক শস্য উৎপাদন এইভাবে পূর্ববর্তী বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মত এই প্রকল্প উপকূলীয় জীববৈচিত্র ও নদীতে প্রবাহমান পলি যা ভূমি গঠনে সহায়তা করে আসছিল বা সেসব বিবেচনা করা হয় নাই। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (**CEP**) উপকূলীয় ইকোলজি, ইকো-হাইড্রোলজি এবং জোয়ারের পলির ভূমিকাকে উপেক্ষা করেছে। উপকূলের **Eco-system** মানুষের সহায়ক হিসেবে দেখা হচ্ছে না, ফলে পরবর্তী এক দশক এর ভিতর উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতার সূত্রপাত ঘটে। এই সমস্যা সমাধানে এডিবি'র অর্থায়নে খুলনা যশোর নিষ্কাশন ও পূনর্বাসন প্রকল্প (**KJDRP**) বাস্তবায়িত হলেও জলাবদ্ধতা নিরসন না হয়ে বরং তা আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ভবদহ, কপোতাক্ষ নদে জলাবদ্ধ সমস্যা ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। মানুষের ঘর বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।

জলাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন পোল্ডার এলাকায় জনগণ প্রতিবাদ করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন স্থানে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁধ কেটে দেয়। ১৯৭৬ নোয়ানিয়া খাল খনন আন্দোলন, ১৯৮৬ ভবদহের রেগুলেটর প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৯৮৮ ডহুরির বিল আন্দোলন ১৯৯০ সালে বিল ডাকাতিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে সফল গণআন্দোলন সম্পন্ন হয় এবং তারা জলাবদ্ধতা নিরসনের উপায় হিসেবে জোয়ার ভাটা পদ্ধতি (**TRM**) কে সমাধান সুপারিশ করতে থাকে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড জীববৈচিত্র সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহে জনগণের বিকল্প প্রস্তাবনাকে উপেক্ষা করে নানা কৌশলে তাদের একদর্শী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প'র পর সরকার জলাবদ্ধতা নিরসণের জন্য অনেক প্রকল্প হাতে নেয় এবং হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে, কিন্তু জলাবদ্ধতার কোন উন্নতি ঘটে নাই। ১৯৮০-৮৫ সালে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে জলাবদ্ধ জমির পরিমাণ ছিল ৯৪০০ একর বর্তমানে ২০০৬-০৯ এ তা বর্ধিত হয়ে দাড়ায় ৩৩১২৫০ একরে। প্রতি বছর এর পরিমাণ গড় পড়তায় বাড়ছে ১২৬৭৫ একরে। নদী বাহিত পলি জলাভূমিতে পতিত হওয়ার পরিবর্তে নদী বক্ষে জমা হতে থাকে। পরিণতিতে নদীর নাব্যতা হ্রাস পায় এবং অসংখ্য নদী ইতোমধ্যে ভরাট হয়ে গিয়েছে এবং আরো কিছু নদী মৃত্যুর অপেক্ষায়।

উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (**CEP**)সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বিরূপ ফল হিসেবে উপকূলীয় জলাভূমির ইকো-সিস্টেমের পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে মানুষ ও পরিবেশ এখন মুখোমুখি। প্লাবন সমভূমি এবং জলাভূমির ইকো-সিষ্টেম এবং এগ্রো-ইকোলজিকে পরস্পর বিরোধী অবস্থান তৈরি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সেখানেই বেশী অনুভূত হবে যেখানে **Natural Ecosystem**'র পরিবর্তন আনা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এই পরিস্থিতিকে সেই কারণে আরো ভয়াবহ করেছে। প্রকল্পের অধিনে নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রচলিত নিষ্কাশন পদ্ধতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ ইকো সিস্টেম **Artificial waterlogged area** পরিণত হচ্ছে।

এই জনগণ জলবদ্ধতা নিরসনের সংগ্রামের পাশাপাশি জলাবদ্ধতার সাথে খাপ খাওয়ানো বা জলাবদ্ধতাকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগও নিয়েছে যেমন চিংড়ি চাষ, চিংড়ি হচ্ছে উপকূলের অন্যতম সিম্বল। কান্দিবেড়ি পদ্ধতি, ধাপ চাষ, মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, মেলে চাষ, কাঁকড়া চাষ, পেন কালচার, মৎস্য ও পাড়ি ফসল এর চাষ করছে ইকো সিস্টেমকে ক্ষতি না করে ।

মাটি বিহীন কৃষি অতি প্রচীন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা পদ্ধতিতে এই চাষের অস্তিত্ব ছিল। এই চাষের প্রচলন কয়েক শতকব্যাপী। কান্দি- বেড়ি পদ্ধতিটি আড়াইশো বছর পূর্বে বর্তমান পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার আতরঘর-কুরিয়ান' ইউনিয়নে প্রচলন শুরু হয়। এই চাষ পদ্ধতি দীর্ঘদিন **Substantial level** এ থাকলেও এখন এই চাষ বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকহারে চাষ হচ্ছে। এই চাষ পদ্ধতি এখন ভবদহ, কপোতাক্ষের জলাবদ্ধ এলাকার ভূক্তভোগী জনগণের জীবন জীবিকার তাগিদে এই চাষে নিয়োজিত হয়েছে এবং তা প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। মাটি বিহীন কৃষি জ্বালানী সাশ্রয়ী এবং এ থেকে প্রচুর জৈব সার পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি খুবই সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব এই চাষে।

গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, পিরোজপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ভাসমান চাষ পদ্ধতি সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকায় কৃষকের বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন হতে পারে।

সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার যেসব অঞ্চলে জোয়ারভাটা খেলে এবং চিংড়ির ব্যাপক চাষ হয় সেসব এলাকায় কাঁকড়া চাষ করা হয়। এইসব অঞ্চলে লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য বসতবাড়ি ও লবণাক্ত ঘেরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্বাদু পানির মৎস্য চাষ শুরু হয়েছে যা জীবন-জীবিকার জন্য সহায়ক এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উপযোগী। জলাবদ্ধ বিলসমূহ বিশেষ করে অভয়নগর বিল বকর, বিল কেদারিয়ায় ধাপ চাষ ও মাছ চাষ করছে পেন কালচারের মাধ্যমে।

ফকিরহাট এলাকায় বাঁধ দিয়ে মৎস্য ও পাড়ি ফসল চাষ করেছে। জলাবদ্ধ ভবদহ এলাকায় ধাপ চাষ, পেন কালচার (পাটা দিয়ে মাছ চাষ) করে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাচ্ছে।

উল্লেখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এখনই প্রমাণিত হয় যে জলাভূমি আর অভিশাপ হিসেবে থাকছে না। বিল ডাকাতিয়ার জনগণ জলাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে জলাভূমিকে সম্পদে পরিণত করেছে। জলাভূমি যে অতি উৎপাদনশীল সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করার ভিতর থেকে জলাবদ্ধতা/জলাভূমি মোকাবেলা করতে যেয়ে এটাকে উৎপাদনশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। উপকূলে বিদ্যমান উপকূলীয় ইকো-সিস্টেম সুন্দরবন এবং সুন্দরবন সংলগ্ন নিম্ন এলাকা ও বিশেষ ধরনের ফ্লোরা-ফুনার (গাছপালা, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ) সমন্বয়ে তৈরি। উপকূলীয় বাঁধ তৈরির পূর্বে মানুষ এই উপকূলীয় **Tidal** ইকো সিস্টেমের সাথে সংগতিপূর্ণ উৎপাদন ও বসবাস স্থাপন করেছিল। উপকূলীয় ইকো সিস্টেম ও এগ্রো-ইকো সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় করে তারা বসবাস করত। কিন্তু বাঁধ দিয়ে লবণ পানির প্রবেশ ও জলাভূমিকে শুষ্কভূমিতে রূপান্তর করতে যেয়ে নদীর জীববৈচিত্র ও জোয়ার ভাটার ইকো সিস্টেম সার্ভিসসমূহকে মানুষের বসতির বিপরীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে আয়লা, নদীভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে।

বাঁধ পূর্বে সামুদ্রিক জলচ্ছ্বাসের তীব্রতা প্রশমিত হতো নদীর গভীরতা ও বিস্তৃত জলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়ার জন্য। এখন নদীসমূহ জলাভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অসংখ্য নদীর নাবতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সাগরে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের পানি নর্দমায় প্রবাহিত পানি বাঁধা পেলে যেমন ফুলে ওঠে তেমনি বাঁধ পরবর্তী নদীর পানি বাঁধ উপচে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রায়শই ভাঙ্গনের ঘটনা ঘটছে। তাই আগামীতে আইলার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান ধারা আগামীতে অব্যাহত থাকলে উপকূলীয় অধিকাংশ নদীগুলো ভরাট হয়ে যাবে এবং বেশিরভাগ পোল্ডারসমূহ স্বাদু/লবণ পানির হ্রদে পরিণত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব হিসেবে একদিকে যেমন: লবণ পানি উপকূল অঞ্চলের প্রায় ১ মাইল ভিতরে প্রবেশ করছে অন্যদিকে জলাবদ্ধতা, নদীভাঙ্গন, বন্যা, ঝড় এর প্রকোপ বাড়ছে।

বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন ও রামসার কনভেনসনের সাথে যুক্ত। জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে অনেক নীতিনিয়ম আছে। কিন্তু জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট আইন বা কনভেনশন এখনও তৈরি হয় নাই। দেশের পানি ব্যবস্থাপনার মধ্যে জলাভূমি বিষয়টি আলাদা গুরুত্ব পায় নাই। ফলে জলাভূমির পরিমাণ দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। জলাভূমি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যের পাশাপাশি মোট সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কেও তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং বিদ্যমান জলাভূমি ব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট নয়। তাই গণসচেতনতার পাশাপাশি সমন্বিত জলাভূমি ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নাই।

প্রচারে ঃ উপকূলীয় পরিবেশ সুরক্ষায় নাগরিক মঞ্চ

সচিবালয় ঃ ইনিসিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আইআরভি), ২০/২, মিয়াপাড়া মেইন রোড, খুলনা। ফোন ঃ ০৪১-২৮৩১৫৩২, মোবা ঃ ০১৯১১-১৩১৯৬১
E-mail : joykhulna@gmail.com, Website : www.irvbd.org